পিআরএসপি অকার্যকর দলিল হবে না তো!

আসজাদুল কিবরিয়া

দারিদ্র্য হ্রাসের কৌশলপত্র (পিআরএসপি) দলিলটির খসড়া রচনা চূড়ান্ত হওয়ার পর ঘুরে ফিরে যে প্রশ্নটি উঠে আসছে, এই জাতীয় দলিলটি কী অকার্যকর দলিলে পরিণত হতে যাচ্ছে? প্রশ্নটা অবশ্য তোলা হয়েছে দলিলের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও অসম্পূর্ণতা পর্যালোচনা করে। এর মানে এই নয় যে পিআরএসপিকে কার্যকর করার কোনো সুযোগ নেই। বরং, আমরা মনে করি এর সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটিগুলো কাটানো গেলে অবশ্যই এটি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চমৎকার দিক-নির্দেশনা হতে পারে। আবার শুধু দিক-নির্দেশনা থাকলেই চলবে না, এটি বাস্তবায়নে রাজনৈতিক সরকারের সদিচ্ছা ও প্রয়াস থাকতে হবে। ফলে, প্রাথমিক অবস্থায় এখন দলিলের অসম্পূর্ণতা নিয়ে যাই বলা হোক না কেন, বাস্তবায়নের অবহেলাই শেষ পর্যন্ত পিআরএসপিকে অকার্যকর করে দিতে পারে।

'আনলকিং দ্য পটেনশিয়াল : ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি ফর এসিলারেটেড পোভার্টি রিডাকশন' নামে ১৮ অধ্যায় সম্বলিত প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠার এই দলিলটি রচনা নিঃসন্দেহে শ্রমসাধ্য কাজ ছিল। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদদের পরামর্শ ও তত্ত্বাবধানে কাজটি সম্পন্ন করেছে এবং এ বছর জানুয়ারি মাসে খসড়া রচনাটি চূড়ান্ত করা হয়েছে। এখন এর ওপর বিভিন্ন আলোচনা-পর্যালোচনা চলছে। এগুলো শেষ করেই এটি চূড়ান্ত করা হবে এবং আগামী তিন বছরের (২০০৫-০৭) জন্য যা কিছু করণীয় সবই হবে এই দলিলের আলোকে। এভাবে তিন বছর অন্তর অন্তর এটিকে মূল ধরে আগামী দিনগুলোর পরিকল্পনা ও কার্যসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন হবে।

দেশীয় বিশেষজ্ঞ দিয়ে, দেশীয় অর্থায়নে প্রণীত দলিলটিতে কোনো বিদেশী সহযোগিতা বা হস্তক্ষেপ ছিল না, প্রণয়নের পূর্বে জাতীয় পর্যায়ে একটি বিভাগীয় পর্যায়ে ছয়টি পরামর্শ সভা হয়েছে এবং খসড়া চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত উন্নয়ন সহযোগীরা চাওয়া সত্ত্বেও তাদের কাছে এটি হস্তান্তর না করার মতো ইতিবাচক বিষয়গুলো ঘটেছে পিআরএসপির ক্ষেত্রে। ফলে, আশা করা যায় যে সরকার চাইলে পিআরএসপি-কে আরো শক্তিশালী করতে পারে।

তবে পিআরএসপি নিয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে দেশের শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদরা বেশ স্পষ্ট ভাষাতেই এর কিছু সমালোচনা করেছেন। তারা প্রায় প্রত্যেকেই বলেছেন যে, এখন দলিলটি যে পর্যায়ে রয়েছে তা শুধু আমলা ও দাতাগোষ্ঠীর দালিলিক শোভাবর্ধন ছাড়া অন্যকিছু হয়নি। তাঁরা দলিলের ভেতর সুসংহত ধারাবাহিকতার অভাব চিহ্নিত করে বলেছেন কোনো কোনো অধ্যায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে রচনা করা হয়েছে। যেমন আর্থিকখাত সংস্কারের বিষয়টি অর্থমন্ত্রণালয় ঠিক করে দিয়েছে। আর এই সংস্কার এখন চলছে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের নির্দেশনা মতো। আবার বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশেষত গ্রামীণ অর্থনীতিতে যে কাঠামোগত পরিবর্তন এসেছে, তা দলিলে উঠে আসলেও সামনের দিনগুলোয় বিশ্বব্যাপী দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার জন্য যে গতিময়তা প্রয়োজন তা নেই বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন, বিগত বছরগুলোয় অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে দরিদ্র মানুষের পণ্য বাজারে বিপণনের সুযোগ হলেও রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় চাঁদাবাজির মতো মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে একই সঙ্গে। এর ফলে উৎপাদক ও ভোক্তা পর্যায়ে পণ্যের দামে এক বিশাল ব্যবধান রচিত হয়েছে। পিআরএসপিতে এই বাস্তবতার আলোকে কৌশল গ্রহণের কোনো দিক-নির্দেশনা নেই।

পরিকল্পনা কমিশনের সঙ্গে এই রুদ্ধদ্বার আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর রেহমান সোবহান, ড. মুহাম্মদ ইউনূস, প্রফেসর ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ এবং সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইদুজ্জামান। তাঁরা স্থানীয় থেকে জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য পরিস্থিতির নিবিড় তদারকি করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন, পিআরএসপি নিয়ে রাজনৈতিক সংলাপ ও জাতীয় সংসদে আলোচনার ওপর জোর দিয়েছেন। কারণ, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত দায়িত্ব রাজনৈতিক সরকারের।

অন্যদিকে উন্নয়ন সহযোগী বা দাতাগোষ্ঠীও পিআরএসএপির কিছু অসম্পূর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করেছে। তবে সর্বশেষ এক বৈঠকে তারা এগুলো সংশোধনের চেয়েও বরং উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এই বলে যে, জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে আগামী দেড়-দুই বছরের মধ্যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হলে পিআরএসপি বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে কিনা। দাতাগোষ্ঠীর এই উদ্বেগের যৌক্তিক একটা প্রেক্ষিত কিন্তু রয়েছে। সরকার পরিবর্তন হলে পূর্ববর্তী সরকারে গৃহীত কার্যক্রম ভালো-মন্দ, বাছ-বিচার না করে বর্জন করার একটা প্রবণতা এ দেশে রয়েছে। তবে, বিএনপি বা আওয়ামী লীগ যেই হোক না বিশ্বব্যাংক-আইএমএফসহ দাতাগোষ্ঠীর নেকনজর কেউই এড়াতে চায় না। আর তাই কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া যখন দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে দাতাদের কথা না বলার জন্য সতর্ক করে দেন এবং অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান যখন 'খাপ খাওয়াতে না পারলে চলে যান' বলে দাতাগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে মন্তব্য করেন, তখন আওয়ামী লীগ নেতারা হৈ হৈ করে ওঠেন 'বাংলাদেশকে বন্ধুহীন বানানো হচ্ছে' বলে অভিযোগ তুলে। সুতরাং, আমরা দাতাগোষ্ঠীকে এভাবে বলতে পারি যে, পিআরএসপির অনিশ্চিয়তা নিয়ে তোমাদের চিন্তা করার দরকার নেই। যে সরকারই ক্ষমতায় থাকুক, এটি নিয়ে কাজ করবে। তবে তা কতখানি গরিব মানুষের জন্য হবে সে প্রশ্ন আমাদের আছে।

তবে পিআরএসপির একটি বড় সীমাবদ্ধতা হলো, এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনীতির নীতি-নির্ধারণ ও পরিকল্পনার বিষয়টি কেন্দ্রীভূত অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমানকে ঘিরে। তিনি যেটা বলেন সেটাই নীতি, তিনি যেটা করেন সেটাই বাস্তবায়ন। দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার ধার তিনি ধারেন না, দেশীয় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ তিনি নিতে চান না। বিশেষত ২০০১ সালে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সাইফুর যেন খুব বেশি করে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের মানুষ হয়ে গেছেন। হয়ে

গেছেন বাজার অর্থনীতির প্রচন্ড একজন অনুরাগী। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার কারণে খোদ প্রধানমন্ত্রী বহুলাংশে তার ওপর নির্ভর করেন। এরকম একজন গুরুত্বপূর্ণ অর্থমন্ত্রী হিসেবে তার পক্ষেইতো সম্ভব দেশের অর্থনীতির উন্নয়ন চিত্রটাকে আরো সমৃদ্ধ করা। কিন্তু তিনি সে পথে না হেঁটে স্বল্পমেয়াদি সুফলের জন্য আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃত্ব স্থাপন করাচ্ছেন দেশে যেখানে দুনিয়ার অন্যত্র এই প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিকূলতার মুখে পড়ছে, নিজেদের নীতি সংশোধন করতে বাধ্য হচ্ছে। যে বাংলাদেশ ব্যাংকে দেশের খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ কমর্কতারা আছেন, সেখানে তাদের মাথার ওপর চাপানো হয়েছে আইএমএফের অর্বাচীন পরামর্শকদের। আইএমএফ এখন যা কিছু করতে চাচ্ছে, প্রায় সবই করানো হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংককে দিয়ে। এই প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব দক্ষতা ও বিচক্ষণতা প্রয়োগের সুযোগ সীমিত করে দেয়া হচ্ছে। অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রীর ওপর দায়িত্ব রয়েছে পিআরএসপি নিয়ে সাংসদ ও রাজনীতিবিদদের সঙ্গে আলোচনার। তিনি এখন পর্যন্ত সে রকম কোনো পদক্ষেপ নেননি। আদৌ নেবেন কি না সে প্রশ্ন উঠতেই পারে। তাছাড়া বাজেটে পিআরএসপির নীতি-কাঠামো অনুসৃত হবে কিনা, বা কতটুকু হবে তাও তো তার ওপরই নির্ভর করছে। এ ধরনের নির্ভরতা তো একটি জাতীয় দলিলকে অকার্যকর করে ফেলতে পারে।

পিআরএসপি দলিল প্রণয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হলো, দেশের মূল নীতি নির্ধারক রাজনীতিবিদরা, অংশগ্রহণ তেমন একটা ছিল না, এখনো নেই। এমনকি ক্ষমতাসীন জোট সরকারের নেতৃবৃন্দেরও এ বিষয়ে কোনো বক্তব্য নেই। ফলে প্রশ্ন হলো শেষ পর্যন্ত রাজনীতিবিদরা এটি অনুসরণ করবেন কি না। নাকি বরাবরের মতো তারা নিজেদের মতো করেই পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরি করবেন। পিআরএসপি নিয়ে কাজ করছে সুশাসনের জন্য প্রচার অভিযান (সুপ্র)সহ এমন এনজিও ও প্রতিষ্ঠানগুলো মনে করে অংশগ্রহণ পদ্ধতির মৌলিক বিষয় হলো, নীতি প্রণয়নে বিবেচনা না করলেও ভিন্নমতগুলো মূল দলিলে লিপিবদ্ধ থাকা উচিত। কিন্তু দলির প্রণেতারা ভিন্নমতগুলো আনেননি, এমনকি যেগুলো আই-পিআরএসপিতে স্বীকৃত ছিল। যেমন রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন, রাজনৈতিক দলে গণতন্ত্র চর্চার অভাব এবং গণমাধ্যমে গ্রামবিমুখতা ইত্যাদি।

তারা আরো বলছে যে, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের মূল কৌশল বাজার উন্মুক্ত করে দেয়ার সুরের সঙ্গে মিল রেখে পিআরএসপিতে বাজার মুক্ত করার এবং সেবাখাতে সরকারি ব্যয় কমানোর কথা বলা হয়েছে। ফলে কোনো চেষ্টা ছাড়াই রাষ্ট্রায়াত্ত মিল কারখানাগুলো বিক্রি করে দিয়ে আরো বেকারত্ব সৃষ্টি করবে। আবার আমদানি শুল্ক নামিয়ে এনে দেশ-বিদেশী ও পার্শ্ববর্তী দেশের পণ্য বাজারে সয়লাব হয়ে যাবে।

পিআরএসপি দলিলে কৃষিতে ভর্তুকি দেবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হলেও ভর্তুকি বাড়ানোর কোনো পরিকল্পনা সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। উল্লেখ্য, ডব্লিউটিওর নিয়ম অনুসারে আমাদের সরকার মোট কৃষি উৎপাদনের ১০% পর্যন্ত ভর্তুকি দিতে পারবে, যেখানে এ অর্থবছরে ঘোষিত ৬০০ কোটি টাকা বা মাত্র ০.৫%। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে একজন কৃষককে তার বিদ্যুৎ বিলের ৮০% পরিশোধ করতে হয় না, যে কারণে আমাদের দেশে ভারতীয় কৃষিপণ্যের দাম কম। ইউরোপে একটি গাভী দৈনিক ২ ডলার করে ভর্তুকি পায় যে কারণে আমাদের দেশের ইউরোপের দুধের দাম আমাদের চেয়ে কম। আমেরিকায় কৃষিতে দৈনিক ১ বিলিয়ন ডলার করে ভর্তুকি দেয়া হয় যে কারণে তাদের কৃষি পণ্যের দাম কম।

একইভাবে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের নীতিমালা মানতে গিয়েই সরকার পিআরএসপিতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো সেবাখাতসমূহে বর্ধিত বরাদ্দের কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি বলে মšব্য করছে প্রতিষ্ঠানগুলো। এমনকি লাগামহীনভাবে যে ব্যক্তিখাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালগুলো গড়ে উঠছে এবং অনেকটা প্রতারণা করে যে তারা জনগণের কাছ থেকে সেবামূল্য আদায় করছে তা নিয়ন্ত্রণের কোনো ব্যবস্থা ঘোষণা করেনি। এর মানে হলো, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের যে অনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যিকীকরণ চলছে তা চলতে থাকবে এবং এ ক্ষেত্রে বিশেষ করে গরিব মানুষ ক্রমান্বয়ে নিজেদের সমভাবে বিকশিত করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে বলে এসব এনজিও ও প্রতিষ্ঠানরা আশংকা ব্যক্ত করেছে।